অভ্যাসের অন্ধকার

প্রেম বিয়ে পরিবার ও সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা

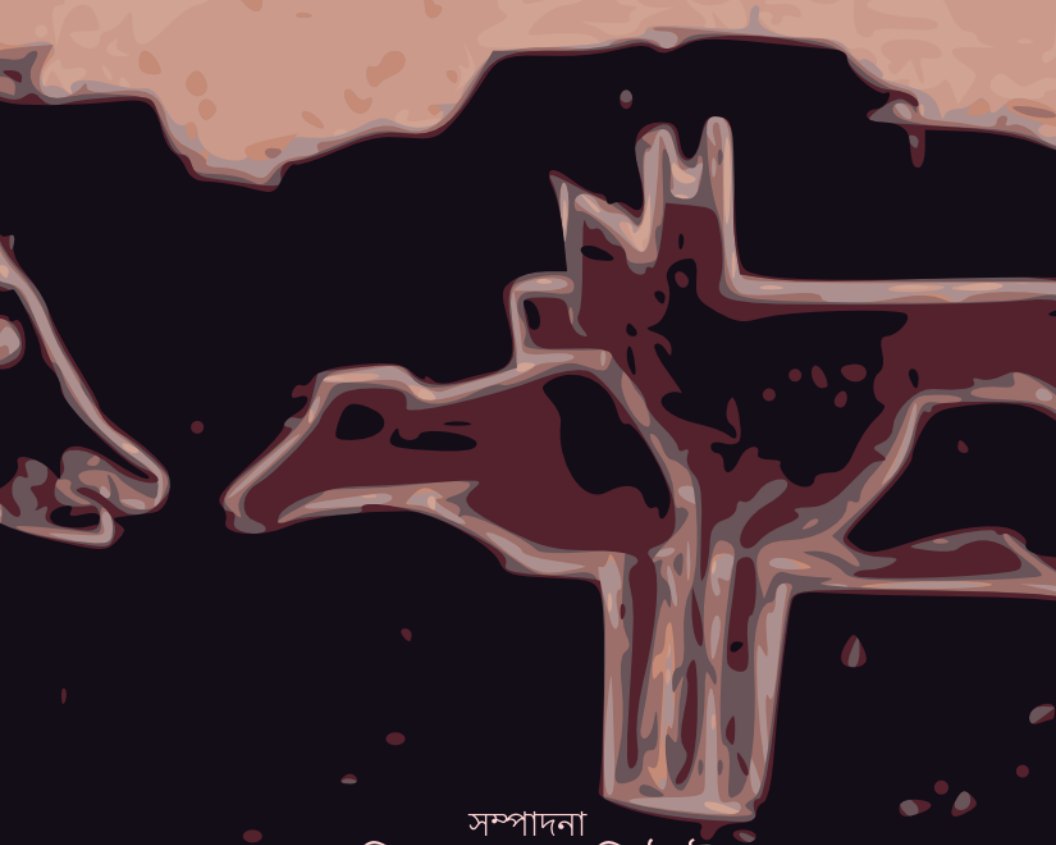

সম্পাদনা
সেলিম রেজা নিউটন

সেলিম রেজা নিউটন

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ

Rabindranath Tagore

যেহেতু ভঙ্গি যার যার– দৃষ্টি সবার, সুতরাং এ বইয়ের কোনো স্ট্যান্ডার্ড দৃষ্টিভঙ্গি নাই। এবং যেহেতু বানান যার যার– ভাষা সবার, সেই হেতু এ বইয়ের প্রমিত বানানরীতিও নাই। অরীতিপ্রবণ এবং অপ্রথামুখর বৈচিত্র্য, মুক্ততা আর আখেরি

উদ্দেশ্যগত সহমর্মিতা এই বইয়ের অন্তঃসলিলা ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ কথিত 'স্বাধীনতা-প্রিয়তা' শব্দটি এই বইয়ের দিশা-অভিসারী শব্দ। 'মার্কসীয় মনীষা' নামে এর দ্বিতীয় ভাগের রচনাগুলোতে দেখা যাবে লেখকেরা কীভাবে সনাতন মার্কসীয় চিন্তা-ঘরানার মধ্যে থেকেও আন্তরিকভাবে লালন করে চলেছেন তাঁদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার পিপাসা। আর, প্রথম ভাগে সম্পর্ক-জিজ্ঞাসার 'নারীবাদী নিরীক্ষণ' তো স্বতঃই নারী-স্বাধীনতা তথা মনুষ্য-স্বাধীনতার বাসনাকে আত্মস্থ করে নিয়েই আছে। উপরন্তু তৃতীয় ভাগে সম্পর্ক-সন্ধিৎসার 'স্বাধীনতাশীল পাঠ' সম্পর্কের স্বাধীনতাজনিত বঙ্গ-ভারতীয় ধারার[১] এক পশলা ধারণা দেবে। এই অংশের তান্ত্রিক ও পৌরাণিক পাঠ বঙ্গ-অঞ্চলের জনসামাজিক পরিসরে সম্পর্কজনিত স্বাধীনতাশীলতার আদিম ও সুপ্রাচীন ধারাগুলোকে শনাক্ত করেছে। স্বাধীনতা-নীতি ও মুক্ত নারী-পুরুষের মুক্ত সম্পর্কই তন্ত্রসাধনার গূঢ় ও অন্তর্গত ইশারা। বঙ্গ-অঞ্চলে তন্ত্র ছাড়া স্বাধীনতার আলাপ সূত্রপাতহীন।[২] তন্ত্র এ অঞ্চলে স্বাধীনতাশীলতার অনাদিকালাগত অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসা। এই ভাগে কলিম খানের অবিস্মরণীয় পুরাণ-বিশ্লেষণও আমার এ দাবিকে সমর্থন করে বলে আমার ধারণা। আদি তন্ত্র থেকে শুরু করে মাঝখানে সহজিয়া বৌদ্ধতন্ত্র ও সহজিয়া বৈষ্ণবতন্ত্র হয়ে এবং বাংলার ও ভারতবর্ষের আরও অজস্র লোকধর্মের রসে জারিত হয়ে অজস্রপথে ক্রমবিকশিত হয়ে আসছে যে ধারা, হরপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ সেই আদিম বঙ্গভারতীয় স্বাধীনতাশীল সামাজিক চিন্তা-ধারারই বিচিত্র উত্তরসূরী।

এ ছাড়া, এমনিতে, এই পুস্তকের রচনা সব বিভিন্ন– বৈচিত্র্যপিয়াসী। এ বইয়ের বিষয়-দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যই বলে দেবে সম্পর্কের স্বাধীনতা নিয়ে বিশেষ কোনো থিওরি বা শাস্ত্র রচনা করার ব্যাপারে এর প্রবল আপত্তি আছে। থিওরি এবং শাস্ত্র স্বভাবতই বৈচিত্র্যবিরোধী। উভয়েই আগাম বিশ্বাসের, অন্ধ বিশ্বাসের, অভ্যাসে চলে। অন্যদের কাছ থেকেও দাবি করে অভ্যাস– দাবি করে শাস্ত্রীয় কর্তব্যবোধ ও ভালোমন্দের মুখস্থ কোড মোতাবেক সম্পর্কযাপনের অভ্যাস। পক্ষান্তরে, প্রেম বা সম্পর্ক স্বভাবতই যাবতীয় কর্তব্যবোধকে অস্বীকার করে – এদের মূলভাব অনুরাগ ও আনন্দের। অনুরাগ-আনন্দ-বৈচিত্র্যের সম্পর্কসাধনাই এই গ্রন্থের আরাধ্য অভিজ্ঞান।

---

১ এ প্রসঙ্গে আমার *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য* গ্রন্থে উপস্থাপিত 'বঙ্গভারতীয় অরাজপন্থা'র ধারণা (পৃষ্ঠা ১২৭) এবং 'নৈরাজ্যের নিত্যতা'র ধারণা (পৃষ্ঠা ১১১–১১৭) দেখা যেতে পারে।

২ স্বাধীনতাশীলতার 'স্বাভাবিক অভিপ্রকাশ' হিসেবে তন্ত্রকে বিচারের ক্ষেত্রে আমার *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য* গ্রন্থের 'তন্ত্র সংঘ তাও জেন সহজ সুফি ও নৈরাজ্য' (পৃষ্ঠা ১৬০–১৬৭) অংশটি দ্রষ্টব্য।

এইডা কিসু হইল !

খুব তাড়াহুড়া করে এই বই। বলতে গেলে আচমকা। কখনো না কখনো করতেই হতো এরকম বই। তাই বলে সেটা যে এখনই করতে হবে সে কথা ক-দিন আগেও বিবেচনায় ছিল না। আসলে সম্পর্কের ভোগান্তি যখন তিল তিল করে চূড়ায় ওঠে তখন সেই দুর্ভোগের বিবরণ ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করাটা ফরজ হয়ে ওঠে। আর সেই ফরজও ওঠে চূড়ায়। সুতরাং নিরুপায়ভাবে বেপরোয়া প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়ে ওঠে বাধ্যতামূলক। লেখা-সংগ্রহ শুরু করাটাকে সূচনা ধরলে সর্বোচ্চ দুই মাসের কাজ এই বই। যত দুর্বলভাবেই হোক, অসম্ভবটা সম্ভব হতে পারল সবাই কিছু না কিছু কাজ করার কারণে – ব্যক্তিগতভাবে এবং দল বেঁধে আড্ডা দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

নামটা মাথায় আসে রংপুরে নিমার সাথে *সামাজিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান* বিষয়ক কোর্স অধ্যয়ন করতে গিয়ে। ঐ কোর্সের অংশ হিসেবে প্রেম, বিবাহ, পরিবার, ও সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কপ্রবণতাগুলোকে পরিষ্কার করে তুলতে যেয়ে তিনি ক্লাসে পড়িয়ে বসেন রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'। কৌতূহল হয়। নতুন করে পড়ি গল্পটা। মাথার ভেতরে পাক খেতে থাকে। নিমার সাথে শেয়ারিং হয়। দাবি করে বসি আমি তাঁর কাছে এ নিয়ে একটি প্রবন্ধ। সেটি রচিতও হয়। এবং 'স্ত্রীর পত্র' রচয়িতা মৃণালের তথা রবীন্দ্রনাথের 'অভ্যাসের অন্ধকার' কথাটা মাথায় গেঁথে যায়।

ওদিকে বাধ্যতামূলক এক কাজে ঢাকায় গিয়ে বন্যা-মানসের বাসায় রাত্রিযাপন -আড্ডায় বসে মানসের কাছে আমি আব্দার করে বসি সম্পর্কজনিত তাঁর সবগুলো রচনা আমাকে গুছিয়ে দিতে। মানস সে সব খুঁজেপেতে একত্র করে পাঠিয়েছেন আমাকে। আসলে এ নিয়ে মানসের বিস্তর রচনা আছে, আমার তিনটা আর নিমার একটা আছে, নিশ্চয়ই চেনাপরিচিত-বন্ধুদের কাছে আরও দু-চারটা পাওয়া যাবে বা তাঁদেরকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া যাবে– এই হিসাবই আমাকে উৎসাহিত করে এবং মানসের কাছে আমি এই বইয়ের প্রস্তাব পেশ করি। মানস বিনাদ্বিধায় কবুল করলে বইটার কাজে আমরা নেমে পড়ি। এবং অচিরেই একটা ঢাউশ জিনিসে পরিণত হয় সেটা। এ বইয়ের ভিত্তি-রচনা হিসেবে কাজ করেছে মানসের আটটা রচনা। ওঁর আরও দুটো লেখা যে আমি অক্ষর-মেরামতির সময়াভাবে ছাপতে পারি নি সেই দুঃখ আমাদের দুজনার যৌথভাবে সম্পাদিত বই না বেরুনো পর্যন্ত যাবে না। এতগুলো লেখা এবং নিজের লেখা ভূমিকা নিয়ে ওর নিজেরই একটা বই হয়ে যেতে পারত দিব্যি।

রেহনুমা আপা তাঁর লেখা ছাপার অনুমতি দিয়েছেন। বইয়ের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। এ্যানী, সায়দিয়া, সুস্মিতা লেখা চাওয়া মাত্র সাড়া দিয়েছেন। সায়দিয়া নিজেরটার পাশাপাশি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ্যানীর লেখার লিংক পাঠিয়েছেন। পরে

এ্যানী ওঁর আরো একটা লেখার খবর আমাকে দিয়েছেন ফেসবুকে। (মনিরুল ইসলাম) কচি ভাইয়ের দুর্দান্ত লেখাটার খোঁজ আমাকে এ্যানীই জানান। যোগাযোগ হিসেবে (আব্দুল হাকিম) লালা ভাইয়ের নম্বরটাও উনিই দেন আমাকে। কচি ভাই ফেরান নি। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও লেখাটা নতুন করে পরিমার্জনা করে দিয়েছেন। মুইন ভাইয়ের লেখাটার সন্ধান পাই *গ্রন্থ ডট কম* নামের উন্মুক্ত অনলাইন লাইব্রেরিতে। পরে তাঁর সাথে যোগাযোগও করিয়ে দেন এ্যানীই। মুইন ভাই সানন্দে অনুমতি দেন। সফট কপি দেন। কিন্তু একটা নতুন লেখা লেখার তীব্র তাড়না অনুভব করে এমনকি লেখাটা শুরু করে অনেক দূর পর্যন্ত লিখেও শেষ করতে পারেন নি এ্যানী। সেটা মিস করছে এই বই। তাঁর উচ্চতর গবেষণার কাজে চরম ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত যোগাযোগ থেকেছে তাঁর সাথে খুঁটিনাটি নানান কিছু নিয়ে– তিনি নেদারল্যান্ডস গিয়ে পৌঁছানোর পর পর্যন্ত। এ্যানীর কাজ এই বইকে এর বর্তমান চেহারার প্রাথমিক আদলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সুস্মিতা গোটা সংসার সামলে, প্রচুর বন্ধু-আগমন সামাল দিয়ে, নতুন একটা স্বতঃস্ফূর্ত লেখা লিখে দিয়েছেন এই বইয়ের জন্য। সে আর লালন সুস্মিতা আমাকে পরিপূর্ণ ছুটি না দিলে এই বইয়ের কথা ভাবাও যেত না। প্রবাসে একা-মা হয়ে সন্তান-সংসার সামলে, উচ্চশিক্ষার সাঁড়াশি চাপ মোকাবেলা করে, নাসরিন খন্দকার যেভাবে তাঁর লেখাটা লিখলেন তা দেখার মতো। ক-দিন ফেসবুক-চ্যাটে বসে তা দেখার সুযোগও হলো। তিনি আয়ার্ল্যান্ড থেকে লেখার খসড়া ফাইল পাঠালেন, আমি সেটার অক্ষর-মেরামত-মতামত করে পাঠালাম, তিনি পরিমার্জনা করলেন, আবার করলেন, আবার করলেন, রেফারেন্স যোগ করলেন, আমি রাজশাহীতে বসে সেগুলো অ্যাডজাস্ট করতে থাকলাম, তিনি কাজ করলেন উইন্ডোজে, ম্যাকে – আমি উবুন্টুতে। নাসরিনের ধৈর্য আর আন্তরিকতায় নিঃশব্দে হাঁ করে থেকে গেলাম। রংপুরে বসেও নিমা যে এই বইয়ের কত প্রকারের কত কাজ করে দিয়েছেন তার শেষ নাই। বন্ধু-সহকর্মী বখতিয়ার বাদল শেষ মুহূর্তে মনে করিয়ে দিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধ্রুপদী লেখাটার কথা।

হরপ্রসাদের সেই লেখা ইলোরা সুলতানা নিজেদের বাসা থেকে খুঁজে বের করে কম্পোজ করে দিয়েছেন নির্ভুল বিন্যাসে। কাজলার প্রিন্স ভাই নিজে লেখা কম্পোজ করে দিয়েছেন চটজলদি, সাথে কম্পোজ করার বাণিজ্যিক লোকও ঠিক করে দিয়েছেন। কবি-ফটোগ্রাফার দঈত আন নাহাল কম্পোজ করে দিয়েছেন কলিম খানের লেখার ফুটনোট ছাড়া অংশ।

খুলনার সংস্কৃতি-সংগঠক, আবৃত্তিকার, চিত্রনির্মাতা কাজল (ইসলাম) ভাইকে একেবারে অন্তিম মুহূর্তে অনুরোধ করলাম 'থার্ড জেন্ডার'দের সম্পর্ক-সংসার নিয়ে লিখতে। তাঁদের সাথে কাজল ভাইয়ের দীর্ঘদিনের ভালোবাসার সম্পর্ক। হাজারটা সাংগঠনিক কাজে ব্যতিব্যস্ত ছুটোছুটি অবস্থার মধ্যেও কাজল ভাই রাজি হয়েছেন।

এবং সবার শেষে উড়ে এসে সে রচনা জুড়ে বসেছে এ বইয়ের কপালে।

মামুন হুসাইন তাঁর লেখা ছাপার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর আক্ষরিক-অর্থে-অকল্পনীয় ব্যস্ততার মধ্যে লেখাটার প্রুফও দেখে দিয়েছেন তিনি নিজে। সে লেখা আমাকে ইমেইল করে পাঠিয়েছেন *রাঢ়বঙ্গ* ছোটকাগজের সম্পাদক ড. অনুপম। আর, বিজয়ে কম্পোজ করা সেই লেখা ইউনিকোডে কনভার্ট করে দিয়েছেন নির্ঝর শাহরিয়ার।

বইটার বেশিরভাগ অংশেরই প্রাথমিক প্রুফ দেখার কাজ হয়েছে *ম্যাজিক লণ্ঠন* ছোটকাগজের কাওসার বকুলের সাথে আমার বিভাগীয় কর্মকক্ষে বসে। একটানা একাঘরে ওঁর সঙ্গ ছিল টনিকের মতো। জরুরি মুহূর্তে চোখের পলকে কলিম খানের বই জোগাড় করে দিয়েছেন বন্ধু-সহকর্মী কাজী মামুন হায়দার রানা। প্রুফ দেখার জন্য বকুলকে জোগাড় করে দেওয়ার কাজটাও করেছেন তিনিই। বিরাট এই বইয়ের দ্বিতীয় প্রুফ দেখার কাজে একেবারে শেষভাগে এসে আমার সহকর্মী শাতিল সিরাজ শুভ যোগ দিয়ে একাই আড়াই শ পাতা দেখে দিয়েছেন অতি অল্প সময়ে। এ ছাড়া মেলা পাতা করে প্রুফ ঝটিকা গতিতে দেখে দিয়েছেন সহকর্মী মাহবুব অনিন্দ্য, *চিহ্ন* ছোটকাগজের রফিক সানি, এবং *ম্যাজিক লণ্ঠন* ছোটকাগজের মাহমুদ সেতু। বেশ কয়েকটা লেখার প্রুফ দেখেছেন নিমাও।

গ্রন্থ ডট কম এবং *মুক্তধারা নেটওয়ার্ক*-এর সংগঠক শশি, ইস্ক্রা, রকি জুতা-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করেছেন যখন যেমন প্রয়োজন। কত্ত কিসিমের কাজ যে এঁরা তিনজনে করেছেন! একদিন আমার আর শশির যখন বেহাল অবস্থা তখন একটা পুরো বেলা সময় দিয়েছেন মিউজিকের শিক্ষার্থী অর্ঘ্য।

বইয়ে মুদ্রিত তন্ত্র বিষয়ক যে মারাত্মক দরকারি রচনাটা ছাপা হয়েছে সেটির সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল সুস্মিতা চক্রবর্তীর কল্যাণে। বইটা তিনি ফটোকপি করে নিয়েছিলেন ইংরেজির প্রবাদপ্রতীম অধ্যাপক, কবি অসীম কুমার দাসের (একেডি) কাছ থেকে। সম্প্রতি একেডি আবার সেই মূল বইটা তাঁর বোনের কাছ থেকে নিয়ে আমাকে দেন ওখানকার স্কেচগুলো স্ক্যান করার জন্য। নামের ইংরেজি অনুবাদেও সাহায্য করেছেন একেডি। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গেকার সেই স্কেচগুলো স্ক্যান ও এডিট করে দিয়েছেন নির্ঝর শাহরিয়ার। এ বইয়ের ফ্ল্যাপের জন্য আমার ছবিও তুলে দিয়েছেন তিনি।

জিএনইউ লিনাক্সভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম উবুন্টু ১৩.০৪-এর লিব্রা অফিস, ইঙ্কস্কেপ, এবং গিম্প সফটওয়ার দিয়ে এই বই বানানো। লিনাক্স-কারিগরিতে নানাভাবে সাহায্য করেছেন সারিম খান, মিয়া মোহাম্মদ হোসাইনুজ্জামান শামীম ভাই এবং আসকার ইবনে আব্বাস।

নানা স্থানে অবস্থানরত, নানা রকমের পেশা-লিঙ্গ-বয়েসের, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি-

ওয়ালা অনেকগুলো মানুষ মিলে যে এত দ্রুত সময়ের মধ্যে এরকম একটা বই মোটামুটি খাড়া হতে পারল– সেটা স্রেফ তাঁদের মধ্যকার বন্ধুত্বের টানে। বন্ধুত্বই এই বই বাঁধাইয়ের আসল সূত্রধর। বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া আর কৃতজ্ঞতা জানানো– এইডা কিসু হইল!

কিন্তু এই বই প্রকাশের জন্য আগামী প্রকাশনীকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেই হবে। অনেক হাঙ্গামার মধ্যেও তাঁরা যত্ন করে ধৈর্য ধরে এ বই ছেপেছেন তার জন্য শুকরিয়া জানানোর বিকল্প নাই।

বাইনারি চিন্তার বিপদ এবং শব্দার্থের পরিপ্রেক্ষিত

শব্দের অর্থ নির্ভর শব্দের ব্যবহারের ওপর, শব্দের পরিপ্রেক্ষিতের ওপর। একটা শব্দের এক এবং অদ্বিতীয় টাইপের কোনো ধ্রুব অর্থ থাকে না। একই শব্দের থাকে একাধিক শব্দার্থ, থাকে নানান অর্থব্যঞ্জনা। কালো যে অর্থে বর্ণবাদ বোঝায়, যেসব বিশেষ পরিস্থিতিতে বোঝায়, সেই ধরনের কোনো অর্থ-পরিস্থিতি *অভ্যাসের অন্ধকার* কথাটার মধ্যে আছে বলে মনে করার কোনোই কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। অন্ধকার বলতে আবশ্যিকভাবে বর্ণবাদী 'কালো' বোঝায় বলে মনে হয় না আমার। অন্ধকার অন্ধকারই। আলো ছাড়া বাঁচি না আমরা। প্রাণের স্ফূরণের জন্য আলো (সূর্যালোক) অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। গৎবাঁধা, মুখস্থ, বিচারবিবেচনাহীন, পাইকারি অভ্যাস সমাজে-সম্পর্কে যে অন্ধকার তৈরি করে তা থেকে বেরুনোর কথা বলা ছাড়া পথ কোথায়? অন্য দিকে, কালো অবশ্য-অবশ্যই রাতকে বোঝায় তা-ও কিন্তু না। রাত প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার নয়। রাতের নিজস্ব আলো আছে, রঙ আছে। এমনকি যেসব প্রাণী (মানুষসহ) আক্ষরিক অর্থে রাতের অন্ধকারের সাথে সখ্য গড়ে তোলে, তাদের চোখ রাতের অন্ধকারে রাতের রূপই দেখে, রাতের আলোই দেখে– অন্ধকারে কানা হয়ে থেকে অন্ধকারকে দেখা যায় না। শাদা-কালো, আলো-অন্ধকার, দিন-রাত, ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, সৎ-অসৎ, চোর-পুলিশ, বড়লোক-গরিব, দেহ-মন, ভাব-বস্তু, নারী-পুরুষ প্রভৃতি বাইনারী ধারণাকে অনড় ধরে নিয়ে তা দিয়ে জগৎবিচারের বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা এক ব্যাপার, আর নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট শব্দের অর্থ উপলব্ধি করা আরেক ব্যাপার।

যখন আমরা বইয়ের শিরোনামে দেখি 'অভ্যাসের অন্ধকার: প্রেম বিয়ে পরিবার ও সম্পর্কজিজ্ঞাসা' তখন অন্তত এটুকু ধারণা তো করতে পারি যে এখানে প্রেম, বিয়ে, পরিবার ও সম্পর্ক বিষয়ক গৎবাঁধা অভ্যাসের, মুখস্থ অভ্যস্ততার, তথা ইনডকট্রিনেইশনের বিষয়-আশয় নিয়েই কথাবার্তা হতে যাচ্ছে। বইয়ের শিরোনাম এক নজরে দেখার সময় পাঠক যদি এটুকুও বোঝেন তাহলেই চলে। উপরন্তু, 'অভ্যাসের অন্ধকার' শব্দবন্ধটা রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' থেকে নেওয়া। 'অভ্যাসের

অন্ধকার' বলতে রবীন্দ্রনাথ নিজে কী বোঝান সেটা উপলব্ধি করার সুযোগও থাকছে সেই রচনা থেকে। আর সেই রচনাটা তো এই বইয়ে থাকছে। আবার 'স্ত্রীর পত্র' নিয়ে নিয়ামুন নাহার নিমার লেখা একটা পর্যালোচনাও এই বইয়ে থাকছে। সেখানেও 'অভ্যাসের অন্ধকার' নিয়ে কথা আছে। 'অভ্যাসের দাসত্ব' বা 'অভ্যাসের শৃঙ্খল' বোঝাতেই 'অভ্যাসের অন্ধকার' কথাটা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন বলেই যে ঐ শব্দবন্ধটাকে পবিত্র জ্ঞান করেছি বা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি, তা কিন্তু না। রবীন্দ্রনাথকে আমি লিবার্টারিয়ান স্পিরিট থেকে দেখি। এই দেখাটা এই বইতেই আমার 'সম্পর্ক স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ' রচনাতে দেখা যাবে। এ ছাড়া আমার 'রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিজম বলশেভিজম' নামে অন্য একটা রচনায় এবং *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য* নামে বইয়ের 'মুক্তিপরায়ণ রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটা অংশে রবীন্দ্রনাথকে এই চোখে দেখার ব্যাপারটা আমি তুলে ধরেছি। এ ব্যাপারে *রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতা-প্রিয়তা* নামে পৃথক একটা বইও আমার যন্তরমন্তর ঘরে যন্ত্রস্থ-মন্ত্রস্থ হয়ে আছে। *অভ্যাসের অন্ধকার* নিয়ে পরিকল্পনা করার সময়ও রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-পরায়ণতার, তথা স্বাধীনতাশীলতার, ঐ স্পিরিটই আমাকে প্রাণিত করেছে। এই বইয়ের প্রত্যেকটা লেখার মুখে ঠাকুরের আঁকা একখানা করে ছবি রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতাশীলতার স্পিরিটের প্রতি আমার অঞ্জলিরই স্মারক। মুশকিল হলো, রবীন্দ্রনাথকে 'মুক্তিপরায়ণ রবীন্দ্রনাথ' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে আমাদের অভ্যাস ব্যথা পায়। রবীন্দ্রনাথ আসলে একাধারে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ এবং স্বাধীনতাশীলতার সাধক। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের সাথে মুক্তিপরায়ণ স্বাধীনতা-শীলতার সম্পর্ক আদতে অতীব ঘনিষ্টই বটে।[৩] একই ব্যক্তির মধ্যে নানা রকম কন্ট্রাডিকশন থাকতেই পারে, কিন্তু কারো মধ্যে একাধারে উদারনীতিবাদ এবং স্বাধীনতাশীলতার উপস্থিতি কোনো কন্ট্রাডিকশন নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তো নয়ই।

সম্পর্ক নিয়ে কথা বলার সময়ও রবীন্দ্রনাথকে আমার প্রয়োজন পড়ে তাঁর স্বাধীনতাশীলতার কারণেই। সম্পর্ক প্রশ্নে নারী-পুরুষের নিজ নিজ অটোনমি বা সম্পর্কের স্বাধীনতাই আমার কাছে মৌল ইশারা। সেই ইশারা 'স্ত্রীর পত্র' রচনায় প্রকটভাবে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'পারিবারিক দাসত্ব' নামে অন্য যে রচনাটা এ বইয়ে থাকছে সেখানেও তা দুর্দান্ত রকমের স্পষ্টতার সাথে পরিস্ফূট হয়ে আছে। এসব কারণে সূচিপত্রে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ আছেন বইয়ের তিনটা ভাগের শেষ ভাগে যার সেকশন-শিরোনাম 'সম্পর্ক-সন্ধিৎসা: স্বাধীনতাশীল পাঠ'। সেই কারণেই 'স্ত্রীর পত্র' থেকে ঐ শব্দবন্ধটা চয়ন করা। সম্পর্কে-সমাজে-সাহিত্যে-বিদ্যায়তনে-রাজনীতিতে

৩ এ নিয়ে আমি আমার উপরোক্ত *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য* গ্রন্থের 'নৈরাজ্যবাদ এবং আলোকায়নের মুক্তিমুখীন চিন্তাধারা' শীর্ষক তৃতীয় ভাগে আলাচনা করেছি।

যাবতীয় সব অভ্যাসের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারটা এই নামের মধ্যে ইমপ্লায়েড আছে বলে আমার মনে হয়। আমার ধারণা, এমনকি সদা-অভ্যস্ত পাঠকেরাও 'অভ্যাসের অন্ধকার' বলতে 'অভ্যাসের দাসত্ব' বা 'অভ্যাসের শৃঙ্খল' বুঝবেন।

সম্পর্কপ্রণালীর সার্বিক ও সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন

সম্পাদনাকর্মও এক প্রকার রচনাকর্মই বটে। রচনাকর্ম মানেই আত্মপক্ষ সমর্থনের, বিশ্লেষণের, নিজেকে বুঝে নেওয়ার একটা চেষ্টা। লিখনই চিন্তন। লিখনে আরোগ্য। রচনাকর্ম মাত্রেই সেই অর্থে নিজের ও নিজেদের ভোগান্তির বিবরণ। বিদ্যমান পরিস্থিতির বিবরণ এবং কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃজনের খসড়া ছবি পেশ করা। মানে ভবিষ্যতের পরিস্থিতির বিবরণও বটে। এই বই হাজির করার জন্য দায়ী আমাদের সামাজিক-ব্যক্তিক-সাম্পর্কিক অনন্ত দুর্ভোগ।

দুর্ভোগ সম্পর্ক নিয়ে। অথচ সম্পর্ক নিয়ে কথা নাই। অধ্যাপকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে, নিজেদের নিয়ে, লেখেন না। ডাক্তাররা ডাক্তারি-ইন্ডাস্ট্রির ভেতরকার খবর প্রকাশ করেন না। (ব্যতিক্রম: লেখক-চিকিৎসক-অধ্যাপক মামুন হুসাইনের *হাসপাতাল বঙ্গানুবাদ*।) বিচারকেরা তো আইনতই বিচার-প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে পারেন না। দম্পতিরা দাম্পত্যের গুমোর প্রকাশ করেন না। বিবাহিতরা বিবাহের অন্তহীন নবায়ন ঘটাতে থাকেন। পরিবার থেকে সেনাবাহিনী পর্যন্ত আমাদের যাবতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান – মৌলিকত – আমাদেরই প্রশ্নাতীত সম্মতি ও আনুগত্যের পবিত্র সব পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। অথচ আমরা সবাই জানি – নিজের নিজের ক্ষেত্রে – এই প্রতিষ্ঠানগুলো সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ অচলায়তনে পরিণত হয়েছে আসলে।

সমস্যার চেয়েও বড় কথা সমস্যা নিয়ে আমরা কীভাবে কতটা আলাপ করি অথবা নীরবতার সাধনা করি। খুনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুন নিয়ে আমাদের কথাবার্তা-বলাবলির প্রবণতাগুলো। আমাদের বলাবলির ধরন-ধারণই বিদ্যমান সম্পর্ক-কাঠামোগুলোকে পরিবর্তন-প্রতিরোধী করে তুলেছে। আমরা সেসব দেখতে পাই না। সেসব নিয়ে কথাবার্তা বলি না, শুনি না। আমাদের চোখে অভ্যাস। শ্রবণে অন্ধকার।

কেন আমরা চোখে দেখি না? কেন আমরা মনে রাখি না যে: দেয়ালেরও কান আছে, আর কানেরও দেয়াল আছে? কারণ তোমার চোখ দেখে না, দেখে তোমার দেখার অভ্যাস। অভ্যাস আমাদেরকে অন্ধ করে দেয়। তখন আমরা দেখি প্রশিক্ষণ দিয়ে। দেখি যার যার প্রিয় প্রিয় মতাদর্শের চশমা দিয়ে। দেখি নিজের নিজের লেখাপড়া দিয়ে। আবাল্যবার্ধক্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়েপিটে তৈরি করা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। আমাদের চোখ নিরাপদে থাকতে চায় আইনের শাসনের দণ্ডবিধির পাহারায়।

ক্যামেরার নজরদারিতে। অধিপতি ধারার শিল্পসাহিত্য, মিডিয়া, শিক্ষালয় এবং শাস্ত্রধর্ম নিরন্তর নবায়ন-পুনঃনবায়ন উৎপাদন-পুনরুৎপাদন করে চলে অভ্যাসের অন্ধত্বকে। অভ্যাসের অন্ধকারকে।

অভ্যাস আসে প্রশিক্ষণ থেকে। ক্রমাগত কন্ডিশনিং থেকে। দীক্ষায়ন প্রকৌশল থেকে। প্রশিক্ষণ যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ অসারতা উৎপাদন করতে থাকে চেতনা – আমরা চলি অভ্যাসে, সচেতনভাবে নয়। পা ফেলি অভ্যাসে, সচেতনভাবে না তাকিয়ে। ফলত হোঁচট খাই এবং দোষারোপ করতে থাকি কপালকে। অভ্যাস চলে চেতনাশক্তি-চর্চার অভাবের জোরে। আমরা যতক্ষণ সচেতন থাকি ততক্ষণ দূরে থাকে অভ্যাস। অভ্যাস মানে চেতন-শক্তির অচেতন হয়ে থাকা। অভ্যাস মানে আমাদের অন্তর্গত-অন্তর্জাত চৈতন্যের শিখাকে সুপ্ত রাখা। অভ্যাস হলো আলোর অভাব। চৈতন্যের অভাব। অভ্যাস তাই অন্ধকার।

আলো আছে প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, সংশয়, বিচার ও অনুসন্ধানে। চেতনার আলো তো আর স্বয়ংক্রিয় অভ্যাসে জ্বলে না। প্রশ্ন দিয়ে, সংশয় দিয়ে, বিচার-বিশ্লেষণ-বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে, যুক্তিবোধ ও ভেদজ্ঞান দিয়ে, অনুমান ও প্রমাণ দিয়ে নিজেকে সার্বক্ষণিকভাবে আলোময় করে রাখতে হয়। তবেই চেতনা কাজ করে ঠিকঠাকভাবে। মুখস্থবিদ্যা দিয়ে, তোতাপাখির বুলি দিয়ে, কী-করিলে-কী-হয় মার্কা প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতনতার চর্চা করা যায় না। চেতনার কোনো বাঁধা পথ নাই। চেতনা এক নিরন্তর ও বিচিত্র অনুশীলন-প্রবাহ।

অন্ধকার বলতে তাই বলে ব্ল্যাকনেস নয়, ডার্কনেস। অন্ধকারের রঙ কালো নয়। কালো নিজে একটা রঙ। কিন্তু অন্ধকারের কোনো রঙ নেই। অন্ধকার রঙের অভাব মাত্র। অন্ধকার আসলে আলোর অভাব মাত্র। প্রশ্নটা তাহলে অন্ধকার নিয়ে নয়, আলো জ্বালা নিয়ে। আলো দিয়ে অন্ধকারকে দৃশ্যমান করে তোলা নিয়ে। দৃশ্যমান হয়ে উঠলেই দূরীভূত হয় অন্ধকার। আলোঢালা দৃশ্যরাশি ফুটে ওঠে আমাদের রচনায়, অনুশীলনে। অনুশীলনও এক প্রকার রচনা। রচনাকর্ম নিজেও তো এক চর্চা। সুতরাং আমরা কীভাবে কথা-চালাচালি করি, লেখালিখি করি, কিংবা নীরবতা পালন করি তা মারাত্মক রকমের জরুরি ব্যাপার।

কীভাবে আমরা চুলের স্টাইল করি, কীভাবে হাঁটি, কীভাবে আমাদের আশ-পাশকে ব্যাখ্যা করি, কীভাবে সঙ্গম করি, কীভাবে আদালতে-শিক্ষালয়ে-সেনা-সংস্থায় আমরা নিজেদের 'বাস্তবতা' শেখাই, কীভাবে আমরা বাবাগিরি-ব্যাটাগিরি-নারীগিরি-এমপিগিরি-কবিগিরি প্রভৃতি করতে থাকি বিনাদ্বিধায়-বিনাপ্রশ্নে তার সবই আমাদের কালাগত অভ্যাস ও সুপ্রতিষ্ঠ প্রচলন থেকে আসে। এর বাইরে কিছু দেখলেই আমরা সন্দেহপরায়ণ হয়ে উঠি। যাবতীয় 'অপর'কে দেখি আপত্তির চোখে। সবাই কেন আমাদের মতো হবে না? 'আলাদা' হবে কেন? তাহলে তো সমাজে

'বিশৃঙ্খলা' দেখা দেবে! 'নৈরাজ্য' দেখা দেবে! সুতরাং 'অপর'কে হতে হবে আমার মতো। পাহাড়িদেরকে হতে হবে সমতল বাঙালি। বরকে হতে হবে বউয়ের মতো। প্রেমিকাকে প্রেমিকের মতো। বিএনপিকে আওয়ামী লীগের মতো। চোরকে পুলিশের মতো। শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষকের মর্জি মতো। আর 'অপর' যদি নিজের মতো করেই জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে তাকে শাসন করতে হবে। রীতিনীতি, বিধিবিধান, আইন-অভ্যাসের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে, সাইজ করতে হবে। আর আন্তরিকভাবে অন্ধ অনুগতদেরকে দিতে হবে পদক এবং পুরস্কার। এইভাবে সংসার থেকে সচিবালয় পর্যন্ত যাবতীয় সম্পর্করাজি আইন ও দণ্ডবিধির নিরিখে নির্ধারিত-পরিচালিত-প্রবর্তিত হতে থাকবে। সম্পর্ক বলতেই কর্তৃত্বপরায়ণ হায়ারার্কি বোঝাবে। গুরুর ওপর গুরু, তার ওপর গুরু; এবং গোলামের নিচে গোলাম, তার নিচে গোলাম। সম্পর্ক মানেই তাই গোলামির গুরুতন্ত্র। সম্পর্ক মানেই আমলা-তান্ত্রিক। সম্পর্ক তখন লাভক্ষতি-নাম-ক্ষমতার হিসাবনিকাশ সম্বলিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক। সম্পর্ক মানেই রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক। যেমন 'ঘুমিয়ে থাকে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে', তেমনি জাগ্রত থাকে রাষ্ট্রপিতা সব নাগরিক-অন্তরে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান-গুলো হয়ে ওঠে একেকটা ছোট ছোট রাষ্ট্র। পাড়ার ১৫ জনে মিলে পাঠাগার গড়ে তোলা হলো তার মধ্যে সভাপতি-সম্পাদক-গঠনতন্ত্র-বহিঃষ্কার-দণ্ডবিধি। পরিবারে মা-বাবা-গুরুজনদের আধিপত্য কিংবা গণতান্ত্রিক ভোটাভুটি। প্রেম মানে বিশেষ একপ্রকার বিজনেস পার্টনারশিপ। বিবাহ মানে আবহমান কাল ধরে বহনীয় এক আইনি চুক্তি। এই চুক্তি রীতিমতো আমাদের দণ্ডবিধির অন্তর্গত। এক কথায় বললে, অভ্যাসের অন্ধকার আমাদের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্ককে পরিণত করেছে কোনো না কোনো প্রকারের আইনি সম্পর্কে। পরিণত করেছে কোনো না কোনো প্রকারের কর্পোবিজনেস-সম্পর্কে। আবার, ঘুরিয়ে দেখলে, আইনি সম্পর্ক মানেই বাণিজ্য-সম্পর্ক এবং বাণিজ্য-সম্পর্ক মানেই আইনি সম্পর্ক। কেননা শাস্ত্র ছাড়া, শাস্ত্রধর্ম ছাড়া আইন চলে না। আইন ছাড়া শাস্ত্র চলে না। আর বাণিজ্যই এ যুগের শাস্ত্রধর্ম, এ যুগের মতাদর্শ। কাজেই, আইন আর বাণিজ্য একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র।

পরিণামে সাজা খাটে সম্পর্ক। নারীপুরুষ সম্পর্ক। সর্বপ্রকার সম্পর্ক। আইনি আনুগত্যের অভ্যাসে সবাই 'অপর'কে চোর মনে করে, সবাই নিজেকে পুলিশ মনে করে। এক দিকে সততা-অসততার খণ্ডিত মূল্যবোধ ও সন্দেহ-পুলিশগিরির আন্তরিক কর্তব্যবোধ, এবং অন্য দিকে লাভক্ষতির বাণিজ্যবোধ – এই দুইই আমাদের যাবতীয় সম্পর্ক-বিচারের কষ্টিপাথর। এই বিচার মোতাবেক 'অপর'কে অসৎ ধরে নিয়ে জগৎবিচার করাটাই আমাদের সততা-নিষ্ঠার নীতি। অপরের অসততাই আমাদের নিজেদের সততাবোধের মানদণ্ড। যাবতীয় সততা-ধারণার মতোই যৌন-সততা ও সম্পর্ক-সততা নামক ধারণাগুলিও এমনভাবে তৈরী যে

অন্যকে/অপরকে অসৎ বলে দোষারোপ করতে না পারলে নিজের সততা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় না। সততার ধারণা মানেই চোর-পুলিশ ধারণা। অসৎ চোর ছাড়া পুলিশের সদাসতর্ক সততার নিরাপত্তা থাকে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কোনো সৎ মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। কারণ এই পদ্ধতিতে সততার ধারণাটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসততার ধারণার ওপর। অসততাই এখানে প্রাথমিক – সততা সেকেন্ডারি, গৌণ। এই ধারণা-প্রণালীতে যেখানে অসৎ মানুষ নাই সেখানে সৎ মানুষের ধারণা গঠন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সম্পর্কগুলো সব টম-অ্যান্ড-জেরি সম্পর্ক হয়ে পড়ে।

মনুষ্য-প্রশ্নটা আমার কাছে আদতে সম্পর্কের প্রশ্ন। নারী-প্রশ্ন নয়। শ্রেণী-প্রশ্ন নয়। মতাদর্শিক শুদ্ধতার প্রশ্নও নয়। সে সব প্রশ্ন তো আছেই। পুরুষাধিপত্যের, শ্রেণী-আধিপত্যের, পুঁজি-আধিপত্যের, ও রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের প্রশ্নগুলো চরম গুরুত্বপূর্ণ – সন্দেহ নাই। সেসব প্রশ্নকে আমাদের যার যার মতো করে ফয়সালা করতেই হবে। কিন্তু সার্বিক বিচারে, প্রশ্নটা আমার কাছে সম্পর্কের প্রশ্ন। সম্পর্কের স্বাধীনতার প্রশ্ন। স্বাধীন সম্পর্ক চর্চার প্রশ্ন। চুক্তিভিত্তিক ও বাণিজ্যভিত্তিক আইনি-রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে বন্ধুত্বভিত্তিক সামাজিক সম্পর্কের দিকে উত্তরণের প্রশ্ন। প্রশ্নটা আমার কাছে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্বতন্ত্র থেকে ব্যক্তি-গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের যথা-সম্ভব-আত্মকর্তৃত্বের দিকে যথাশীঘ্র-যাত্রার প্রশ্ন। সার্বিক ও সুনির্দিষ্ট এসব প্রশ্ন নিয়েই এই বই।

বিশেষ দুজন ব্যক্তির সম্পর্কযাপনের মধ্যকার আলো-অন্ধকার-আবছায়া এ বইয়ে আমার আগ্রহের বিষয় না। এতে আমার আগ্রহ মানুষে-মানুষে সম্পর্করচনার সেই আর্থ-রাজনৈতিক পাটাতনটির প্রতি, যা আমাদের সম্পর্করাশিকে ডুবিয়ে রেখেছে আইনি-রাজনৈতিক-ব্যবসায়িক সম্পর্কের গাড্ডায়– খোদ মানবীয় সম্পর্ক জিনিসটাকে আড়াল করে রেখেছে অপরিচয়ের অন্ধকারে। এই পাটাতনটাকে শনাক্ত করার সাথে সম্পর্কের যাবতীয় খুঁটিনাটির বিস্তৃতি নিয়ে আলাপ তোলার কোনো বৈরিতা নেই। পাটাতনটা তৈরি করা হয়েছে তিলতিল অভ্যাসের অনাদি অন্ধকার দিয়ে। এই সর্বব্যাপক অন্ধকারকে না দেখে আলো-অন্ধকারের যান্ত্রিক যুক্তিপ্রণালী প্রয়োগ করে খোদ সম্পর্ক জিনিসটাকেই অন্ধকার-অস্পষ্ট-আবছায়া বলে ভাবাটা নিতান্তই আত্মঘাতী হবে। সম্পর্ক হলো সেই জিনিস যা দিয়ে মানুষ শুধু অপরকে চেনে না, নিজেকেও চেনে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল যেমন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন বিন্দুর সাথে তাঁর সম্পর্কের চোখ দিয়ে। সম্পর্কই অপরিচয় ঘোঁচায়। ঘোঁচায় অপরিচয়ের অন্ধকার। তৈরি করে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের অন্তর্গত তাগিদ। আত্মপ্রকাশ বলতে উপলব্ধিরই প্রকাশ। উপলব্ধি আসে আবার যাপন থেকে। অথচ যাপন নিজেও আত্মপ্রকাশই বটে! উপলব্ধি আর যাপন তাই আলাদা কিছু না।

উপলব্ধিই যাপন হয়ে ওঠে, আবার যাপনই উপলব্ধি। এ দুই দেহ-মনের মতোই অবিভাজ্য। অবিভাজ্য বলেই পুস্তক রচনার মাধ্যমে বা অন্য যেকোনো মাধ্যেম বিচিত্র উপলব্ধির অজস্র আত্মপ্রকাশের সার্থকতা। পুস্তক আকারে উপলব্ধির আত্মপ্রকাশ অনিবার্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে আমাদের সম্পর্কযাপনের ওপর। কীভাবে করে, কতুটুকু করে, কত মিটার বা কত লিটার করে, কখন করে– তা আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘড়ি-নিক্তি ধরে পরিমাপ করে দেখতে পারি না। যা পরিমাপ করতে পারি না, তার কোনো অস্তিত্ব নাই– এরকম মনে করার কোনো কারণ দেখি না। পরিণামে পুস্তকের প্রভাব ও কার্যকরিতা সম্পর্কে আমার মনে সংশয় আসে না। পুস্তক প্রণয়নের এ ছাড়া আর কীইবা কারণ থাকতে পারে– হাততালি-পুরস্কার-প্রশংসা-নাম-খ্যাতির অবান্তর প্রসঙ্গগুলোর কথা বাদ দিলে? সহজ হাততালি পাওয়ার জন্য, পাওয়ার মতো, যে এই বই নয়– তা তো বোঝাই যায়। বাকি থাকে সম্পর্ক-উদযাপন আর আনন্দময় আত্মপ্রকাশ। আত্মপ্রকাশের আনন্দই স্বাধীনতা।[৪]

পশ্চিমপাড়া, রাবি: ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫

৪ বাংলা ভাষায় স্বাধীনতাবোধের প্রকাশ আমি এখন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিখছি বলে তাঁরই 'সঙ্গীতের মুক্তি' রচনা থেকে শেষ এই বাক্যটা নিজের মতো করে খাড়া করলাম। মনুষ্য-স্বাধীনতা তথা ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ও রাষ্ট্রের বিপরীতে সামাজিক আত্মশক্তির বিকাশ ইত্যাদি প্রভৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-বহির্ভূত বাংলা রচনায় ভালো তিনটা লেখার কথা কোথাও শুনেছি বলেও তো মনে পড়ে না। (শুনতে পেলে আনন্দিতই হবো অবশ্য!)